তবুও বিয়াল্লিশ

দেখতে দেখতে আরও একটা বছর পেরিয়ে ৪২ বছরে পদার্পণ করলো এই পত্রিকা। সেই ১৯৮৫ সাল থেকে একটানা ৪১ টা বছর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়া একটা ছোট পত্রিকা চালিয়ে যাওয়া বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে যথেষ্টই কষ্টকর। প্রতিটি কাগজেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, আমরাও তার বাইরে নয়। ফেলে আসা চার দশকে আমরা অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছি। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে বিস্তর। তার প্রতিফলন আমাদের কাগজে ফুটে উঠেছে। প্রযুক্তি উন্নতহওয়ার সাথে সাথে সংবাদপত্র প্রকাশনাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এই পত্রিকাও সাধ্যমত সেই প্রযুক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করেছে -তা আমাদের পাঠকরা জানেন। আমাদের সীমিতসামর্থের মধ্যেও আমরা পাঠকদের একটা ঝকঝকে মুদ্রণের পত্রিকা পৌঁছে দিতে পারি এটা পাঠকদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রেও আমরা চেষ্টা করি নিজস্ব ধারা বজায় রাখতে। গতসংখ্যা থেকে আমাদের পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই পাঠকরা লক্ষ্য করেছেন। বর্তমানে মোবাইল এবং পোর্টাল সংবাদের যুগে এখন মিনিটে মিনিটে মুঠোবন্দী খবর। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে পনের দিন পর পর প্রকাশিত একটা কাগজে দশ পনের দিন আগের পুরনো খবর পাঠকরা পড়বেন কেন? তাই আমরা চেষ্টা করেছি স্থানীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ক্রীড়া ইত্যাদি যে বিষয়গুলির স্থায়ী গুরুত্ব রয়েছে সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক খবরে গুরুত্ব দিতে। আবারও বলছি এই দ্রুত গতির যুগে দশ পনের দিনের পুরনো খুন-চুরি-বলাৎকার আর বর্তমান রাজনীতির খবর নিয়ে একটা কাগজ, বিশেষত ছোট কাগজ চালানো খুবই কষ্টকর। মুখ চেনা থাকায় সে কাগজ নিতে হয়ত পাঠকরা বিমুখ করেন না, কিন্তু তা পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে অথবা পাঠককে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে না। তাই পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক কাগজগুলিকেও তার দৃষ্টিভঙ্গী, সংবাদ পরিবেশনার ধরণ, অলংকরণ ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। আমাদের চিন্তায় সেসব বিষয়গুলিই রয়েছে। কিন্তু ওই যে, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়া ছোটকাগজ চালিয়ে যাওয়ার সমস্যা আমাদেরও গ্রাস করছে। করোনা পরবর্তী সময় থেকে মানুষ যতই মোবাইল নির্ভর হয়েছে, ততই খবরের কাগজ পড়ার আগ্রহ কমছে। বিশেষত জৌলুষহীন ছোট কাগজ পড়ার আগ্রহ তো আরও বেশি কমছে। এটা মনে রাখতে হবে ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে কাগজ হয়ত বিক্রি হয়, কিন্তু সবাই যে তা মন দিয়ে পড়েন একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আর একটা বিষয়ও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, তা হ'ল বিগত প্রায় দু দশক সময়ে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতির এতটাই পরিবর্তন হয়েছে যে এখন অনেকেই স্কুল বা কলেজ ছুট হয়ে কাজের জন্য অন্যত্র চলে যাচ্ছে, ফলে ছোট পত্রিকাকে ভালবেসে তারজন্য সময় দেওয়া, সংবাদ সংগ্রহ করা, কাগজ বিক্রি করা বা নিজের নামে সংবাদ প্রকাশ হলে আনন্দ পাওয়া এসব আর খুব একটা দেখা যায় না-তাকে যে রোজগার করতেই হবে, ছোট কাগজ তো তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, তাই ছোট পত্রিকাকে দু-একজনের অন্ধ ভালোবাসাতেই তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলতে হবে। এভাবেই সকলে মিলে কাজ করার অভ্যাস নষ্ট হবে। ক্লাব গুলিতে তরুণ মুখ কম দেখা যাবে, নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের লেখা গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সাহিত্য কম দেখা যাবে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ৪২ বছরের পথচলার ক্ষেত্রে নতুন কোনো স্বপ্ন আমরা দেখাতে পারব না। শুধু চেষ্টা করব আমাদের এই পরিকাঠামোর মধ্যেই চিন্তা ভাবনা দিয়ে কাগজটাকে কি করে আরও গ্রহণীয় করে তোলা যায়। আশাকরি আপনারা পাশে থাকবেন।

কতটা ত্যাগে গড়ে উঠেছিল শান্তিপুর কলেজ তা ভুলে গেলে চলবে না

১৯৫১ সালে গড়ে ওঠা শান্তিপুর কলেজের সায়েন্স ব্লক

কেউ এনে দিয়েছিলেন নিজের সমস্ত গহনা। কেউ নিজের কষ্টার্জিত অর্থ। কেউ দিয়েছিলেন শ্রম। এলাকার মানুষদের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রসহ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের চেষ্টায় এভাবেই গড়ে উঠেছিল শান্তিপুর কলেজ। একসময় তার শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল গোটা নদিয়া। কিন্তু সম্প্রতি শান্তিপুর কলেজে ছাত্র ভর্তি কমতে কমতে উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। কলেজের সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবার তৎপর হয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। সত্যনারায়ণ গোস্বামীর লেখা। ২য় কিস্তি

কী ভাবে, কী উদ্দেশ্যে, কত মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল শান্তিপুর কলেজ তা আগের সংখ্যায় উল্লেখ করেছি। উল্লেখ করা হয়েছে কলেজের নানান সুযোগ সুবিধা ও গৌরবের কথা। সেই তালিকা আরও দীর্ঘ হতেই পারে। আসলে পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে শান্তিপুর কলেজ অনেকটাই এগিয়ে ছিল। এখন তা আরও উন্নত। কলেজের ১৫ টি বিভাগের মধ্যে ৮টি বিষয় রয়েছে কলা বিভাগে, বিজ্ঞান বিভাগে রয়েছে ৬ টি বিষয় এবং বাণিজ্য বিভাগে রয়েছে ১টি বিষয়। রয়েছে ১৬ টি ল্যাবরেটরি - যারমধ্যে পদার্থবিদ্যার ৭ টি, রসায়নের ৩ টি, অঙ্কের ২টি, প্রাণিবিদ্যার ১ টি, উদ্ভিদবিদ্যার ১টি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন-এর একটি। কলেজে বর্তমানে সম্পূর্ণ সময়ের শিক্ষক রয়েছেন ৩৪ জন, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার (SACT) ২৩ জন, গ্রন্থাগারিক ১ জন, অতিথি শিক্ষক ১৮ জন, নিয়মিত ৪ জন। এছাড়া কলেজের লাইব্রেরীতে বই রয়েছে প্রায় ৩০ হাজার, তারমধ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে ২৬ হাজার বই, বিভাগীয় গ্রন্থাগারে ৩ হাজার এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রয়েছে প্রায় ১হাজার। এছাড়া অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, সুযোগ সুবিধা তো রয়েছেই।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল যে গুলো উল্লেখ করা হলো তার চেয়ে কম পরিকাঠামোতে যেখানে একসময় কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল, সেখানে বর্তমান পরিকাঠামোয় ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা যখন আরও বাড়তে পারত, তখন তার পরিবর্তে কলেজে বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এসে পৌঁচেছে মাত্র ২৩০০ তে, যা একটি ভালো মানের হাইস্কুলের চেয়েও কম। কিন্তু ছাত্রভর্তিতে শান্তিপুর কলেজের কেন এই অধঃপতন? এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ডই হলো ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা না থাকলে প্রতিষ্ঠানই বন্ধ। আর তার মেরুদণ্ড হলো নিয়ম-শৃঙ্খলা। এটা ঠিক যে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে শান্তি পুর কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনেকটাই ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজে আর্থিক দুর্নীতিরও অভিযোগ ওঠে মাঝে মধ্যেই। এই কলেজ যেহেতু সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠেনি, এখানকার ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে, এখানকার মানুষের অর্থে শান্তিপুর প্রাণ কয়েকজন মানুষের আন্তরিক চেষ্টায় এই কলেজ গড়ে উঠেছিল-সেই কারণে এই কলেজের ভালো মন্দে শান্তিপুরবাসীরও ভালো-খারাপ লাগার বিষয়টি জড়িয়ে থাকে।

এই কলেজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ছিলেন যাদের অনেকেরই কলেজের প্রতি অনুরাগের কথা এখনও এখানকার মানুষের মুখে আলোচিত। সেই ধারা এখনকার অধ্যাপকদের ক্ষেত্রেও বজায় থাকবে এটাই কাম্য। তেমনই কলেজ প্রশাসনের মাথায় যিনি থাকবেন সেই কলেজের অধ্যক্ষও তাঁর পদের প্রতি সুবিচার করবেন এটাও কাম্য। তাঁর প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা যদি অটুট না থাকে তাহলে কলেজের পরিবেশও যে ভালো থাকবে না সে কথা বলাই বাহুল্য।

খারাপ লাগলেও একথা অস্বীকার করার নেই যে শান্তিপুর কলেজের এই প্রধানের পদটি ঘিরে একাধিকবার বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে - যা হয়ত উচিত ছিল না। একথা সত্যি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক প্রধান যদি শক্ত হাতে প্রতিষ্ঠানের হাল ধরতে না পারেন, যদি মেরুদণ্ড সোজা রাখতে না পারেন, যদি দুর্নীতির প্রশ্নে নির্লোভ হতে না পারেন তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। শান্তিপুর কলেজের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিষয় আছে কি-না তা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘদিন যারা কর্মসূত্রে জড়িত তারাই ভালো বলতে পারবেন। শান্তিপুরবাসীর বরং খারাপই লাগবে তাদের গর্বের একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে যারা থাকেন তাদের নামে যদি কোনো অশ্রদ্ধার কথা ভেসে আসে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির কলুষ থেকে মুক্ত করতে হবে - একথা আজকের নয়। কিন্তু বাস্তবে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেন রাজনীতির অঙ্গন হয়ে উঠছে। কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দীর্ঘদিন বন্ধ, তবু ছাত্রনেতাদের দাপট বিভিন্ন কলেজে - একথা প্রায়শই শোনা যায়। শান্তিপুর কলেজে ছাত্রভর্তিতে মাথা গলায় কারা? কেন সঠিক ফি'স দিয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন আটকে যায়? - এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? এসব কাজে জড়িত কারা, কাদের সাহায্যে এসব কাজ হয় - তা খুঁজে বের করে তাদের কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। না হলে কলেজের বদনাম তো বাড়তেই থাকবে। যেমন কলেজের সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়, নির্মাণ -এসব কাজ দুর্নীতিমুক্ত এবং ত্রুটি মুক্ত হচ্ছে কি না তা দেখার দায়িত্ব কে নেবে? কলেজের মধ্যে অসামাজিক কাজ হচ্ছে কি না, অথবা কলেজের মধ্যেই শিক্ষকরা হুমকি বা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন কি না বর্তমান সংবাদ ব্যবস্থার দৌলতে সত্যি মিথ্যা যাই হোক এসব খবর শহরে কান পাতলেই বিভিন্ন জনের মুখে শোনা যায় - যাতে শহরের সুস্থ চিন্তার মানুষরা বিব্রত বোধ করেন, হতাশ হন, সর্বোপরি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারই প্রতিফলন ঘটে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কম যদি একটা কারণ হয় তাহলে বাকি কারণ ওপরের গুলো।

শান্তিপুর কলেজে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক- শিক্ষিকার সংখ্যা কম নেই। তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের কাছে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তবু সব ক্ষেত্রেই কিছু ব্যতিক্রম থেকেই যায়। শিক্ষকদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখেও একটা কথা উল্লেখ করতেই হয়, শুধু তো চাকরি নয় আপনারা আছেন একটা মহান ব্রত নিয়ে - সেই কথাটাকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলে আপনারাই বা চলবেন কি করে? একথা জোর দিয়েই বলা যায় শান্তিপুর কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক- শিক্ষিকার ব্যবহার, গুন-মান এবং আচার- আচরণ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক। তবু, দল বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য যদি কারো থেকেও থাকে তাকে কলেজের ভালো কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে, কলেজের ক্ষতি হয় সেই কাজে নয়, পৃথিবী আবর্তিত হয় বৃত্তাকারে - এটা চিরসত্যটা ভুলে গেলে চলবে না।

এসব তো লোকমুখে শোনা এবং সমাজ মাধ্যমে ভেসে আসা খবরের কম্পন মাত্র। প্রকৃত ঘটনাগুলো কলেজ কর্তৃপক্ষই জানেন। তারাই বলতে পারবেন শান্তিপুর কলেজ সবদিক দিয়ে তার গরিমা ধরে রেখেছে না পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে পিছিয়ে যে যাচ্ছে তার প্রমাণ কলেজের ছাত্র ভর্তির পরিসংখ্যান। এই প্রবণতা এখনই বন্ধ করতে না পারলে তা আগামীতে কলেজের ক্ষেত্রে একটা মহা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

আশার কথা, কলেজের নতুন অধ্যক্ষ ডঃ সঞ্জীব পাকিরা কলেজের গভর্ণিং বডির সহায়তায় সঠিক জায়গায় আলোকপাত করে কলেজের গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ইতোমধ্যে তারা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপও নিয়েছেন। অধ্যক্ষ বলেছেন শান্তিপুরের মানুষরা যাতে শান্তিপুর কলেজেই ভর্তি হয় তারজন্য তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদের নিয়ে এখানকার স্কুলগুলিতে যাবেন এবং প্রয়োজনে বিশিষ্ট নাগরিকদের বাড়িতেও যাবেন, কথা বলবেন যাতে ছেলেমেয়েরা এই কলেজে ভর্তি হয়। তাঁর এই উদ্যোগে পাশে দাঁড়াচ্ছেন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা। নিঃসন্দেহে এই ভাবনা প্রশংসাযোগ্য। তবে তার বাস্তবায়ন এবং ফলপ্রসূ প্রয়োগের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে শান্তিপুর কলেজের ভবিষ্যত। নতুন অধ্যক্ষ যেটা ভেবেছেন বা বুঝেছেন সেটা অনেকেরই বোঝা এবং করা উচিত ছিল। কারণ একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমরা যে লেখাপড়া করি তার পেছনে দেশেরও অবদান থাকে, আমরা যে চাকরি করি, আমাদের পরিবার প্রতিপালন করি, তা নিজের যোগ্যতায় হলেও তার পেছনে রাষ্ট্রের অবদান থাকে। তাই রাষ্ট্রের স্বার্থে, ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে আমাদের সকলের উচিত তার পরিধির মধ্যে যতটুকু সম্ভব ভালো কিছু করা। আমরা আশাবাদী, শান্তিপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যাপকদের সহযোগিতায় শান্তিপুর কলেজকে আবার তার গৌরবে ফিরিয়ে আনবেন এবং তা হবে শান্তিপুরবাসীর কাছে একটা বড় উপহার। *(শেষ)*